সেই চারটি বছর

বিভাস চক্রবর্তী

এই শিরোনামটি দেবার একটা কারণ আছে। আমাদের স্বাধীনতা, যার অপর নাম দেশভাগ, তার পাপে অনেক মানুষই আজীবন দগ্ধেছেন, কেউ কেউ শেষও হয়ে গেছেন। নিজের জীবনের যাত্রাপথে সেটা আরও অনেকের মত আমিও মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছি। আমার উদ্বাস্তু-ছাত্রজীবনে কোনো একটি স্কুলে একাদিক্রমে দু-বছরের বেশি পড়তে পারিনি। সেখানে চার-চারটি বছর প্রেসিডেন্সিতে পড়া মহাভাগ্যের কথা। শিব তো নয়ই, বাঁদর হয়েছি কিনা জানি না - যা-ই হই না কেন, সেই গড়ে ওঠার সময় এই মহাবিদ্যালয়ের কোনো-না-কোনো ভূমিকা নিশ্চয়ই ছিল। সেকথাই বলার চেষ্টা করেছি এখানে। - **বিভাস চক্রবর্তী**

১৯৫৩ সালে প্রাইভেটে স্কুল-ফাইনাল পাশ করে বরাতজোরে প্রেসিডেন্সির মতো কলেজে আই-এ ক্লাসে ভর্তি হতে পেরেছিলাম। কলেজের পক্ষ থেকে নতুন ছাত্রদের স্বাগত জানাবার সময় শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ইউ এন ঘোষাল মহাশয় আমাদের এই সৌভাগ্যের কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলেছিলেন, সব সময় মনে রাখবে তোমরা এশিয়ার শ্রেষ্ঠ একটি কলেজে পড়তে এসেছ। আমি সারাজীবনই সেকথা মনে রেখেছি, স্যার। সবচেয়ে বড়ো কথা, আমার কলেজও আমার মতো সামান্য একটি ছাত্রের কথা মনে রেখেছে। না, যার জন্য প্রেসিডেন্সির এত খ্যাতি ছাত্র হিসেবে সেই এক্সেলেন্সের কারণে অবশ্যই নয়। ১৯৫৬ সালে প্রেসিডেন্সির শতবর্ষ (১৯৫৫) উপলক্ষ্যে একটি বেশ মোটাসোটা স্মারক-পুস্তক বের হয়েছিল। তাতে শততম বর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের একটি তালিকা ছাপা হয়েছিল এবং সেখানে আমার নামটি যে স্থান পেয়েছিল তাতে আমার ব্যক্তিগত কোনো কৃতিত্ব ছিল না, কিন্তু আজও পর্যন্ত সেটা আমার আহ্লাদের কারণ হয়ে আছে তো বটেই। আবার কলেজের পৌনে-দুশোতম বছরটি যখন পালিত হল সেই উৎসবে ডাক পড়ল আমার নাট্যদলের, আমারই নির্দেশিত 'মাধব মালঞ্চী কইন্যা' মঞ্চস্থ করার জন্য। নাট্যমহলে কিছুদিনের জন্য অন্তত কলার তুলে ঘোরার সুযোগ পাওয়া গেল! আর আজ ২০০ বছরে পড়ল আমাদের কলেজ, স্মরণিকার এই লেখাটির জন্য কথাকলি অনেকবার আমার সঙ্গে কথা কইলেন। সব মিলিয়ে এই সংকুচিত বুকের খাঁচাটি ফুলে ঢোল। যে হিসেবটা দেওয়া হল তাতে সালগুলো তালগোল পাকিয়ে যেতে পারে, অনেকে মেলাতে না-ও পারেন। হিসেবটা এইরকম : ১৮১৭ সালের ২০শে জানুয়ারি হিন্দু কলেজের পত্তন, সেই অনুযায়ী আজ দ্বিশততম বর্ষের উদ্‌যাপন, হিন্দু কলেজের মহাপাঠশালা বিভাগটির নামান্তর যেহেতু ঘটেছিল ১৮৫৫-তে, নাম দেওয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ, তার শতবর্ষ পালিত হল ১৯৫৫-তে, আমরা যখন ছাত্র, ১৯৯২-তে হল হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার ১৭৫ বা পৌনে-দুশো বছর।

আই-এ পরীক্ষায় মোটামুটি ভালো রেজাল্ট করেছিলাম। মনে পড়ছে আমরা যেদিনকে বি-এ ক্লাসে ভর্তির ফিজ জমা দিলাম, সেদিন ঐ অঞ্চলটি প্রবল বৃষ্টিতে ভেসে যাবার যোগাড়। হাঁটুজল ভেঙে আমরা কয়েকজন বন্ধু মিলে সেদিন ঠনঠনের 'বীণা' সিনেমা হলে ম্যাটিনি শো-তে 'পথের পাঁচালী' (বই ও ছবির বানান রেখে দিলাম) দেখতে গিয়েছিলাম। তার অনতিকাল পরেই বোধ করি শতবর্ষের অনুষ্ঠানটি ছিল। সেই উৎসবে প্রাক্তনীরা অভিনয় করলেন বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়ের নাটক 'শ্রীমধুসূদন' এবং বর্তমাননীয়েরা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'মুক্তধারা'। প্রাক্তনীদের মধ্যে, যতদূর মনে পড়ে, ছিলেন তখনকার মঞ্চ এবং চলচ্চিত্রের বাঘা বাঘা অভিনেতা - নরেশ মিত্র, বিকাশ রায় (তাঁর শতবর্ষ চলছে), রাধামোহন ভট্টাচার্য, বীরেশ্বর সেন প্রমুখরা। তখন ভাবতে ভালো লেগেছিল যে অন্য অনেক বিখ্যাত কৃতী ছাত্রের মত এঁরাও তো প্রেসিডেন্সির মুখ উজ্জ্বল করেছেন। আমার কাছে তাঁরা ছিলেন অনুপ্রেরণা। আবার অন্যদিকে আমার অন্তরে-বাহিরে তখন নতুন সিনেমা এবং নতুন থিয়েটারের প্রবল দাপাদাপি চলছে। কলেজে ঢোকার আগে ১৯৫২-তে কলকাতায় প্রথম আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবে দেখে ফেলেছি ডি-সিকা'র 'বাইসাইকল্ থিফ', 'মিরাকল্ ইন মিলান', সদ্যবিপ্লবোত্তর চিনের ছবি 'হোয়াইট হেয়ার্ড গার্ল', জাপানি 'য়ুকিওয়ারিশু'। বাসা ছিল শ্যামবাজারে, ক্লাস এইট-নাইন পড়েছি টাউনস্কুলে - একেবারে বাংলা সিনেমা-থিয়েটার হাবের মধ্যিখানে। স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা এবং রেজাল্ট বেরোনোর ফাঁকটুকুতে

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

রঙমহলের সেই রবিবার সকালে আরেকটি অসাধারণ নৃত্য-গীত উপস্থাপনা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম – 'নবান্ন'। সেটা বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন' নয়, গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যপ্রতিভা শম্ভু ভট্টাচার্যের আরেকটি অনন্য সৃষ্টি সেই 'নবান্ন'। এসবকিছু থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের নাট্যভাবনায় একটা পরিবর্তন আসছে, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে।

দেখে নিয়েছি স্টার-এর 'শ্যামলী', কলেজে ঢোকার একবছরের মাথায় নিউ এম্পায়ারে বহুরূপীর 'রক্তকরবী' এবং উৎপল দত্তের 'ম্যাকবেথ'। পাশাপাশি টকি শো-হাউসে এবং রোববার সকালে বাংলা হলে হলিউডি ছবি দেখার ধুম।

মোটের মাথায় সেই সময়টায় সংস্কৃতিচর্চা চচ্চড় করে ফুটছে আমার অন্তর্কটাহে। আরে সেই চুল্লিতে হাওয়া দিয়ে যাচ্ছে প্রেসিডেন্সি কলেজও। তখন কলেজে নাটক করতেন সিনিয়ার দাদারা। খুব সম্ভবত প্রথম অ্যানুয়াল সোশ্যালে দেখেছিলাম শরবিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিষের ধোঁয়া' আর পরশুরামের 'চিকিৎসা সংকট' নিউ এম্পায়ার হলে। সেই সময় এম্পায়ারের মতো মঞ্চে কলেজ-সোশ্যাল করাটা ছিলো বেশ আভিজাত্যের ব্যাপার। তাছাড়া কাহিনি বা নাটক বাছাইয়েরও তারিফ করতে হয় বই-কি! কয়েকজনের অভিনয়ও ছিল দেখার মতো, শেখার মতো। সবার নাম মনে নেই, কিন্তু দীর্ঘদেহী সুনীতি ভোঁসের দাপুটে অভিনয় ভুলি কীকরে! কিংবা ব্রতীন ভট্টাচার্যের সূক্ষ্ম সংবেদনশীল অভিনয়। যদিও একটি কারণে 'এশিয়ার শ্রেষ্ঠ কলেজ'-এর খেতাবপ্রাপ্ত বিদ্যায়তনে 'অচলায়তন'-সুলভ রক্ষণশীলতা আমার মর্মপীড়ার কারণ হয়েছিল। কেন জানি না, কলেজছাত্রদের নাট্যাভিনয়ে নারীচরিত্রে ছাত্রীদের অভিনয় নিষিদ্ধ ছিল! আধুনিক শিক্ষা ও মননচর্চার পীঠস্থান এই মহাবিদ্যালয়ে এ কী ভয়ংকরী বা 'শুভংকরী' ফতোয়া! তাহলে কি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধিনিষেধ ছিল? তা-ও তো মনে হয় না। কারণ, শুনেছি প্রায় একই সময়ে আন্তঃবিশ্ববিদ্যালয় নাট্যপ্রতিযোগিতায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাটকে একই সঙ্গে দিব্যি অভিনয় করেছেন আমাদের প্রার্থনা বসু, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়দের সঙ্গে! কলেজে আরেকটি অতি-বোকা নিয়মও চালু ছিল তখন, কবে থেকে জানা নেই। আই-এ ক্লাসে কোনো ছাত্রী নেওয়া যাবে না, শুধুমাত্র বি-এ ক্লাসে ভর্তি হতে পারবে, অর্থাৎ কো-এডুকেশন চলবে। কেন? কোনো উত্তর মেলেনি অদ্যাবধি। স্বাগত-ভাষণে ইউ এন ঘোষালও এর ব্যাখ্যা দেননি। বি-এ ক্লাসের ছেলেমেয়েরা একসঙ্গে মিলবে-মিশবে, আড্ডা মারবে, গুলতানি করবে, আর আমরা বঞ্চিত ইন্টারমিডিয়েটরা ফ্যালফ্যালিয়ে চেয়ে চেয়ে দেখব সারাদিন প্রতিদিন। কলেজে ঢুকে আমাদের মতো কিছু ছাত্র একেই তো মরমে মৃতপ্রায় ছিলাম, স্কুল-ফাইনালে ফার্স্ট-হওয়া সহপাঠী মোটাসোটা গোলগাল গঙ্গাধর যশ কিংবা আমার মত চিকনা-নাটা হাফ-প্যান্ট পরে কলেজে যেতাম প্রথম দিকে। তার ওপর এই সেগ্রিগেশনিস্ট বা লিঙ্গ-বিভাজন নীতি আমাদের মধ্যে অদ্ভুত এক হীনমন্যতার জন্ম দিয়েছিল। একঝাঁক মেয়েকে বন্ধু হিসেবে পাবার প্রথম সুযোগটাই মাঠে মারা গেল – ঐ বয়সে সে এক মর্মান্তিক আঘাত। উহা যাউক গিয়া, নাটকের কথায় ফিরে আসি। আমার দেখা দ্বিতীয় অ্যানুয়াল সোশ্যাল কিন্তু বাইরের সংস্কৃতিচর্চার সঙ্গে অনেক বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। সেবার আমন্ত্রিত হয়ে এসেছিলেন বহুরূপী নাট্যগোষ্ঠী, তাঁদের দুটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের নাটক দেখলাম রঙমহল প্রেক্ষাগৃহে – একটি 'সেদিন বঙ্গলক্ষ্মী ব্যাংকে', আরেকটি 'বিভাব'। প্রথমটি ছিল আন্তন চেখভের একটি প্রহসনের বাংলা রূপান্তর, মোক্ষম রূপান্তর ঘটিয়েছিলেন 'সতত নতুন পথের সন্ধানী', একই সঙ্গে বহুরূপী ও লিটল থিয়েটার গ্রুপের প্রিয় নাট্যকার অজিত গঙ্গোপাধ্যায়। দ্বিতীয়টি শম্ভু মিত্রের রচনা এবং পরিচালনা। প্রহসনটি জমে গিয়েছিল অমর গাঙ্গুলি, তৃপ্তি মিত্র, কুমার রায় ও মহম্মদ জ্যাকেরিয়ার অসাধারণ অভিনয়গুণে। মুর্হুমুহু হাসিতে ফেটে পড়ছিল প্রেক্ষাগৃহ। দ্বিতীয় নাটকে সেট-আসবাবহীন মঞ্চে শুধুমাত্র নিপুণ বাচিক এবং কায়িক অভিনয়ে নাটকের মজার খেলা খেলতে খেলতে এমন এক গভীর জায়গায় পৌঁছে গিয়েছিলেন বহুরূপীর শিল্পীরা যে দর্শকরাও মজাটা তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করতে করতে ক্রমশই অনুভব করছিলেন সমসময়ের উত্তাপ এবং যন্ত্রণা, উত্তেজনার মন্থন চলছিল অন্তরে এবং বোধে, চোয়ালগুলি কখন যেন শক্ত হয়ে উঠছিল প্রতিবাদ-প্রতিরোধের নীরব আকাঙ্ক্ষায় বা শপথে। রঙমহলের সেই রবিবার সকালে আরেকটি অসাধারণ নৃত্য-গীত উপস্থাপনা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম – 'নবান্ন'। সেটা বিজন ভট্টাচার্যের নাটক 'নবান্ন' নয়, গণনাট্য সঙ্ঘের নৃত্যপ্রতিভা শম্ভু ভট্টাচার্যের আরেকটি অনন্য সৃষ্টি সেই 'নবান্ন'। এসবকিছু থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের নাট্যভাবনায় একটা পরিবর্তন আসছে, আধুনিকতার ছোঁয়া লাগছে। নিয়মকানুন, বিধিনিষেধ আর সনাতনের বেড়াজাল ভেঙ্গে বাইরের মুক্ত পৃথিবীর সঙ্গে মিলতে চাইছে তারা। আমরা সেই ভাবনাকেই আরো খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছিলাম।

বি-এ ক্লাসে ইউনিয়নের দায়িত্ব এবং ক্ষমতা এল আমাদের ব্যাচের হাতে। ইউনিয়নের একটি স্বতন্ত্র ড্রামাটিক সোসাইটি বা নাট্যপর্ষদ ছিল। সম্পাদক নির্বাচিত হল সহপাঠী শ্যামল চৌধুরী, আমরা বন্ধুরা ডাকতাম 'শ্যা-চৌ' বলে। ওর সঙ্গে মাঝে মধ্যে এখনও দেখা হয় কেন্দ্রীয় সরকারী কর্মীদের ওয়েলনেস সেন্টারে। পর্ষদের ভারপ্রাপ্ত অধ্যাপক ছিলেন আরেক চৌধুরী, বাংলার বিশিষ্ট শিক্ষক ভূদেববাবু। আমাদের মধ্যে নাটকের ব্যাপারে প্রচুর উৎসাহ ছিল যাদের তারা হল বাংলা বিভাগের ছাত্র নিখিলেশ সেনগুপ্ত, প্রাণীবিদ্যা বিভাগের সলিল ভট্টাচার্য, আর ভূগোলের ছাত্র আমি। এবারে প্রশ্ন উঠল, কী নাটক বা কেমন নাটক করা যায়? আমাদের লক্ষ্য স্থির হল – ঠিক নাটক করা চাই, আর ঠিকভাবে করা চাই – আরেকটা বহুরূপী গোষ্ঠীর ইস্তেহারকে সামনে রেখে, কারণ আমাদের তখন বহুরূপী তো বটেই, অজিত গঙ্গোপাধ্যায়ও পেয়ে বসেছেন। 'বহুরূপী' পত্রিকায় অজিতবাবুর

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073

লেখা একটি ছোটো নাটক 'আজকের উত্তর' পছন্দ হল আমাদের। ভূদেববাবুও তাতে সম্মতি দিলেন। নাটকে চার্বাকের দর্শন-টর্শন নিয়ে প্রচুর দার্শনিক কথাবার্তা ছিল। ভারি ভারি কথা, অথচ স্বাভাবিকভাবে বলতে হবে। এমনভাবে বলতে হবে দর্শকরা যাতে মন দিয়ে শোনে, বুদ্ধি দিয়ে বোঝে, আবার প্রাণ খুলে উপভোগও করতে পারে – অত্যন্ত কঠিন কর্ম সন্দেহ নেই। সটান বহুরূপীর অমর গাঙ্গুলির কাছে গিয়ে হাজির হলাম। দাবি পেশ করলাম – আমাদের একটু বুঝিয়ে দেবেন নাটকটা, দেখিয়ে দেবেন সঠিক অভিনয়। ভাগ্য ভালো বলতে হবে, ওঁর মতো একজন কঠিন শৃঙ্খলার মানুষ অর্বাচীন অ্যামেচারদের এই দাবি মেনে নিলেন। রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ অফিসে কাজ করতেন, ব্রেবোর্ন রোডে। অফিস ছুটির পর বহুরূপীতে হাজিরা দেবার আগের ফাঁকটুকুতে নিয়মিত আসতেন তিনি। আমাদেরও তখন কলেজ ছুটি হয়ে গিয়েছে, ফাঁকা ইউনিয়নরুমে মহলার ব্যবস্থা। মূল অভিনেতা আমি আর নিখিলেশ, আরেকজন কে যেন ছিল। নিখিলেশ-সলিলের ছিল সহজাত অভিনয়ক্ষমতা। আর আমার ছিল শেখার আগ্রহ। অমরদা আমাদের নাটকটা বোঝাতেন, চরিত্রগুলিও ব্যাখ্যা করে বলতেন। একদিকে সঠিক অভিনয়পদ্ধতিও যেমন শেখাচ্ছেন, অন্যদিকে আমাদের কাঁচা অভিনয়ের দোষত্রুটিগুলো স্পষ্ট করে ধরিয়ে দিচ্ছেন। এতদিন অভিনয় বলে যা ভেবে এসেছি বা করে এসেছি তার অনেকটাই যে ভুলে-ভরা, অমরদা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে না-দিলে সেটা মালুম হত না। অন্যদিকে নাটকটা আমাদের বন্ধু-দর্শকরা যেভাবে গ্রহণ করলেন তাতে আমরা বেশ আশ্চর্যই হয়েছিলাম। এই নাটকটার পরিচালক ছিলাম আমি। তবে সেটা নামেই, যা করার করেছিলেন অমরদাই। নিখিলেশের পরিচালনায় আরেকটি নাটক আমরা করেছিলাম, সেটাও অজিত গঙ্গোপাধ্যায়েরই লেখা – 'নব স্বয়ংবর'। একটি মেয়েকে বিয়ে করার বাসনায় পাঁচ কিসিমের পাঁচটি লোক এসে জুটেছে, তাই নিয়ে যত মজা-মস্করা। মঞ্চ-পরিকল্পনা করেছিলাম আমি। নিখিলেশ অসাধারণ অভিনয় করত একটি মাতালের চরিত্রে, আজও চোখে ভাসে। নিখিলেশ আর সলিল অকালে চলে গেল, বড়ো বেশি আগে চলে গেল!

নটে গাছটি এখানেই মুড়োলো না। বি-এ পরীক্ষার ফল বেরোনোর আগেই ঢুকে পড়তে হয়েছে চাকরিতে। দমদমে আমার পিতৃদেবের অনুপ্রেরণায় একটি ছোটো নাট্যদলও গড়ে ফেলেছি। এদিক-ওদিক, বিশেষ করে প্রতিযোগিতা-মঞ্চে নাটক করে বেড়াই। দমদমের দেবীনিবাসী বন্ধু অশোক মুখোপাধ্যায় (আমার বহুদিনের থিয়েটারের সাথী) তখন প্রেসিডেন্সিতে পড়ছে। একদিন আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত অশোক – আমার কাছে নয়, আমার বাবার কাছে। কলেজে অভিনয়ের জন্য একটি নাটক চাই। বাবা তখন রেডিওর জন্য মাঝেমধ্যে কিছু নাটক লিখতেন। 'খড়ম' নামে একটি নাটক লিখে দিলেন অশোকদের জন্য। তাতে খুব ভালো অভিনয় করেছিল দ্বিজেন বাগচী। আমাদের প্রিয় এই সুদর্শন সুকণ্ঠ সু-অভিনেতাটিও অকালপ্রয়াত। 'বাবলা'-খ্যাত নীরেন ভট্টাচার্য (সংস্কৃত কলেজের ছাত্র, ব্রতীন ভট্টাচার্য-সতীন্দ্র ভট্টাচার্যের ভাই) নাটকটাতে ছিল কিনা আমার এখন মনে পড়ছে না। তবে খুব জমেছিল নাটকটা। যার ফলে নাটুকে ছাত্রদের পীড়াপীড়িতে পরের বছরও আবার নাটক লিখে দিতে হল বাবাকে – এবার 'ভ্যানিটি ব্যাগ'। প্রাক্তনী নিখিলেশ তার শিংজোড়াটি ভেঙে জুনিয়ারদের সঙ্গে ভিড়ে গিয়ে আবারও কেরামতি দেখাল, নাটকটাও জমে গেল। আর আমাকে কোন অদৃষ্ট যেন ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে এল গ্রুপ থিয়েটারের মূল ধারায় – বহুরূপীতে প্রশিক্ষণ, তারপর অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডাকে 'নান্দীকার'-এ যোগ। আর ফেরা গেল না!

ব্যক্তিগত স্তরে কয়েকজন সহপাঠী ছাড়া প্রাক্তনীদের সঙ্গে আমার তেমন যোগাযোগ কখনওই ছিল না। বেশ কয়েক বছর আগে হঠাৎই অগ্রজ প্রাক্তনী জ্যোতির্ময় পালচৌধুরী ডেকে নিলেন প্রাক্তনী-সংগঠনের সাংস্কৃতিক কাজকর্মে। অনেকগুলি অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছি, ভাষাপাঠ শ্রুতিনাটক সবই করেছি, থিয়েটারের বন্ধু প্রেসিডেন্সিয়ান অরুণ মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয় করেছি, আবার আমার নিজের গ্রুপের নাটকও আমন্ত্রিত হয়েছে প্রাক্তনীদের অনুষ্ঠানে। আমার সমনামের অনুজ প্রাক্তনী বিভাস চৌধুরীর উৎসাহে-আগ্রহে এবং নেতৃত্বে শামিল হতে হয়েছে একাধিক উদ্যোগে। নিরন্তর উৎসাহের গুঁতো খেতে হয়েছে ঊর্মি, শান্তা, স্বপ্না, কথাকলি, বিতান এবং আরো আরো ছোটোদের কাছ থেকে। সময় দিতে পারিনি, কথা রাখতে পারিনি অনেকসময়, কিন্তু একথা স্বীকার না-করে পারব না যে, এইসব অনুজদের মাধ্যমেই প্রেসিডেন্সি কলেজের সঙ্গে আমার যোগসূত্রটি অবিচ্ছিন্ন রাখতে পেরেছি। এই প্রসঙ্গে একটা কথা আমাদের মত সংশ্লিষ্ট সকলের মনে রাখা বোধহয় প্রয়োজন যে, প্রেসিডেন্সি কলেজের (বা বিশ্ববিদ্যালয়ের) মতো একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানার্জন, অধ্যয়নের ক্ষেত্রে যে উচ্চ লক্ষ্যমান থাকে সংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সামঞ্জস্যপূর্ণ মান বা মাত্রা বজায় রাখার দায়িত্ব সমভাবে বর্তায় প্রাক্তন বা বর্তমান ছাত্রছাত্রীদের ওপর। সাংস্কৃতিক অ্যামেচারিত্ব প্রতিষ্ঠানের মান বাড়ায় না কখনওই।

নিজের কাছেই চির-অকৃতজ্ঞ বিবেচিত হব, যদি এই সুযোগে আমি প্রণাম না-জানাই জ্ঞানজগতের সেইসব পূজনীয় দেবতাকুলকে – আমার অধ্যাপকদের, ধন্যবাদ না-জানাই আমার অসাধারণ মেধাসম্পন্ন সহপাঠীদের যাঁদের মিলিত মেধা ও মননের চর্চা আলোকিত করে রেখেছিল আমাদের মহাবিদ্যালয়কে এবং গর্বিত করেছিল আমাদের দেশকে। প্রেসিডেন্সি এখন কোথায় দাঁড়িয়ে আমি বলতে পারব না, বলার অধিকারও আমার নেই। কিন্তু গোড়ার সেই চার-চারটি বছর ভুলি কেমনে!

Courtesy: Presidency Alumni Association Calcutta, Kolkata 700073